ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৩য় পত্র: আত তাফসীরুল ফিকহী-২

مجموعة (ب) : الاسئلة الموجزة

খ অংশ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

سورة لقمان (সূরা লুকমান)

৩২. اذكر وجه التسمية لسورة لقمان - [সূরা লুকমান-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।]

৩৩. اكتب موضوعات سورة لقمان مختصرا - [সূরা লুকমান-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।]

৩৪. "بين سبب نزول الاية "ومن الناس من يشترى لهو الحديث ... الاية - [ومن الناس من يشترى لهو الحديث-এর শানে নুযুল বর্ণনা কর।]

৩৫. لم قال الله تعالى "جنات النعيم ولم يقل نعم النعيم"؟ - [মহান আল্লাহ কেন جنات النعيم না বলে نعم النعيم বলেননি?]

৩৬. بم نصح لقمان ابنه؟ اكتب بايجاز - [হযরত লুকমান (আ) তাঁর পুত্রকে কী উপদেশ দিয়েছেন? সংক্ষেপে লেখ।]

৩৭. من قال "ان الشرك لظلم عظيم" وفى اية سورة؟ - [ان الشرك لظلم عظيم কে বলেছেন? কে তা কোন্ সূরায়?]

৩৮. ما معنى الشرك وكم قسما له؟ - [الشرك-এর অর্থ কী এবং তা কত প্রকার?]

৩৯. بين حقوق الوالدين على الاولاد - [সন্তানের প্রতি পিতামাতার অধিকারসমূহ বর্ণনা কর।]

৪০. اكتب التعليمات الحاصلة عن سورة لقمان - [সূরা লুকমান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ।]

سورة السجدة (সূরা আস সাজদা)

৪১. اذكر وجه التسمية لسورة السجدة - [সূরা আস সাজদা-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।]

৪২. اكتب موضوعات سورة السجدة مختصرا - [সূরা আস সাজদা-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।]
৪৩. ما المراد بقوله تعالى "الذى احسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ... الاية"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী الذى احسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين-এর মর্মার্থ কী?]
৪৪. بين سبب نزول الاية "تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ... الاية" - [تتجافى جنوبهم عن المضاجع আয়াতটির শানে নুযুল বর্ণনা কর।]
৪৫. ما المراد بجنات المأوى فى قوله تعالى "اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا" - [মহান আল্লাহর বাণী نزلا এবং جنات المأوى-এর মধ্যকার جنات المأوى দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
৪৬. اكتب التعليمات الحاصلة عن سورة السجدة - [সূরা আস সাজদা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ।]

سورة الأحزاب (সূরা আল আহযাব)

৪৭. اذكر وجه التسمية لسورة الاحزاب - [সূরা আল আহযাব-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।]
৪৮. اكتب موضوعات سورة الاحزاب مختصرا - [সূরা আল আহযাব-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।]
৪৯. من الذى ادعى ان فى جوفه قلبين؟ - [কোন ব্যক্তি দাবি করেছিল যে, তার পেটে দুটি হৃদয় আছে?]
৫০. ما معنى الاحزاب؟ وفى اية سنة وقعت هذه المعركة؟ او متى وقعت غزوة الاحزاب؟ - [الاحزاب-এর অর্থ কী? কোন্ সনে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়? অথবা আহযাবের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়?]
৫১. بين الواقعة لغزوة الاحزاب على ضوء سورة الاحزاب - [সূরা আল আহযাব-এর আলোকে আহযাবের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা কর।]
৫২. اكتب ايتين فى اثبات ختم النبوة - [খতমে নবুয়ত প্রমাণ করে এমন দুটি আয়াত লেখ।]
৫৩. ما معنى الطلاق؟ وكم قسما له؟ - [طلاق-এর অর্থ কী? তা কত প্রকার?]

৫৪. بين شرائط النكاح بالاستدلال - [দলীলসহ বিবাহের শর্তাবলি বর্ণনা কর।]
৫৫. هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة؟ بين بالايضاح - [هبة শব্দ দ্বারা কি বিবাহ সংঘটিত হবে? সুস্পষ্ট বর্ণনা দাও।]
৫৬. بين مقدار المهر مع اختلاف الائمة - [ইমামগণের মতভেদসহ মোহরানার পরিমাণ বর্ণনা কর।]
৫৭. هل كان المهر واجبا على النبى عليه الصلاة والسلام؟ ومن من الموهوبات للنبى عليه الصلاة والسلام؟ بين - [মহানবী (স)-এর ওপরও কি দেনমোহর ওয়াজিব ছিল? যেসকল রমণী নিজেদেরকে মহানবী (স)-এর জন্য হেবা করেছেন, তারা কারা? বর্ণনা কর।]
৫৮. اذكر اسماء زوجات النبى صلى الله عليه وسلم - [নবী কারীম (স)-এর স্ত্রীগণের নাম উল্লেখ কর।]
৫৯. اكتب التعليمات الحاصلة عن سورة الاحزاب - [সূরা আল আহযাব থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ।]

سورة لقمان (সূরা লুকমান)

৩২. প্রশ্ন: সূরা লুকমান-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।
(اُذْكُرْ وَجْهَ التَّسْمِيَةِ لِسُورَةِ لُقْمَانَ)

উত্তর:

ভূমিকা: পবিত্র কুরআনের ৩১তম সূরা হলো 'সূরা লুকমান'। এটি মক্কায় অবতীর্ণ একটি হিকমতপূর্ণ সূরা। নামকরণের ক্ষেত্রে সাধারণত সূরার কেন্দ্রীয় চরিত্র বা বিশেষ কোনো ঘটনার ওপর ভিত্তি করা হয়।

নামকরণের কারণ (وَجْهُ التَّسْمِيَةِ):

এই সূরায় হযরত লুকমান (আ.)-এর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১. লুকমান (আ.)-এর উপদেশ: আল্লাহ তাআলা এই সূরায় লুকমান (আ.)-এর সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশগুলো তুলে ধরেছেন, যা তিনি তাঁর সন্তানকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ

অর্থ: "আমি অবশ্যই লুকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি।" (সূরা লুকমান: ১২)।

২. তাত্ত্বিক গুরুত্ব: তাফসীরুল মুনীর-এর মতে, লুকমান (আ.) নবী ছিলেন না, বরং একজন 'হাকিম' বা মহাজ্ঞানী ওলি ছিলেন। তাঁর উপদেশগুলো তাওহীদ, আখলাক ও আদবের সারনির্যাস। এই মহান মনীষীর নাম ও তাঁর শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করেই আল্লাহ তাআলা এই সূরার নাম রেখেছেন 'সূরা লুকমান'।

উপসংহার: মূলত হযরত লুকমান (আ.)-এর নাম ও তাঁর হিকমতপূর্ণ নসিহতগুলো এই সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হওয়ায় একে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৩৩. প্রশ্ন: সূরা লুকমান-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।
(اُكْتُبْ مَوْضُوعَاتِ سُورَةِ لُقْمَانَ مُخْتَصَرًا)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা লুকমান একটি মাক্কী সূরা। তাই এতে ইসলামি আকিদা এবং চরিত্র গঠনের মৌলিক বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে।

বিষয়বস্তু (مَوْضُوعَاتُ السُّورَةِ):

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে সূরা লুকমানের প্রধান বিষয়বস্তুগুলো নিম্নরূপ:

১. কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব: সূরার শুরুতে কুরআনকে 'কিতাবুল হাকিম' বা প্রজ্ঞাময় কিতাব হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যা সৎকর্মশীলদের জন্য হেদায়েত ও রহমত।

২. তাওহীদ ও শিরক: শিরককে 'জুলুমুন আজিম' বা মহা-অন্যায় আখ্যা দিয়ে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। আসমান-জমিন সৃষ্টির নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণ করা হয়েছে।

৩. লুকমান (আ.)-এর নসিহত: পিতা কর্তৃক পুত্রকে দেওয়া উপদেশ—যেমন শিরক না করা, পিতামাতার সেবা, সালাত কায়েম এবং অহংকার বর্জনের শিক্ষা এই সূরার প্রাণ।

৪. গায়েবি ইলম: সূরার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান (কিয়ামত, বৃষ্টি, গর্ভস্থিত সন্তান, আগামীকালের উপার্জন এবং মৃত্যুর স্থান) একমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে।

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ...

৫. কাফেরদের হঠকারিতা: কাফেরদের অযৌক্তিক তর্ক এবং অন্ধ অনুকরণ (বাপ-দাদার দোহাই)-এর নিন্দা করা হয়েছে।

উপসংহার: সংক্ষেপে, এই সূরাটি ঈমানি আকিদা এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা।

৩৪. প্রশ্ন: "ومن الناس من يشترى لهو الحديث ... الاية"-এর শানে নুযুল বর্ণনা কর।

(بَيِّنْ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ... الْآيَةَ")

উত্তর:

ভূমিকা: জাহেলি যুগে মানুষ যাতে কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট না হয়, সেজন্য কাফেররা নানা ফন্দি ফিকির করত। সূরা লুকমানের ৬ নং আয়াতটি সেই প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়।

শানে নুযুল (سَبَبُ النُّزُولِ):

মুফাসসিরগণের মতে, বিশেষত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায়, এই আয়াতটি মক্কার কুখ্যাত কাফের নজর ইবনে হারিস সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

১. বিদেশি কিসসা-কাহিনী: নজর ইবনে হারিস ব্যবসার জন্য পারস্যে (ইরান) যেত। সেখান থেকে সে আজমীদের রাজা-বাদশাদের কাহিনী (যেমন—রুস্তম ও ইসফন্দিয়ারের গল্প) কিনে আনত। যখন রাসূল (সা.) মানুষকে কুরআন শোনাতেন, তখন নজর বলত, "মুহাম্মদের কথার চেয়ে আমার গল্পগুলো অনেক ভালো।" এভাবে সে মানুষকে কুরআন থেকে বিমুখ করত।

২. গায়িকা দাসী ক্রয়: কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সে গায়িকা দাসী খরিদ করত। যখনই কোনো লোক ইসলামের প্রতি ঝুঁকত, সে ওই দাসীকে বলত, "একে গান শোনাও এবং পানাহার করাও।" তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে গান-বাজনায় মগ্ন রেখে দ্বীন থেকে দূরে রাখা।

এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ নাজিল করেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থ: "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্য 'অসার বাক্য' (গান-বাজনা বা মিথ্যা গল্প) খরিদ করে।"

উপসংহার: এই আয়াতের মাধ্যমে গান-বাজনা এবং অশ্লীল বিনোদনের মাধ্যমে মানুষকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার জঘন্য ষড়যন্ত্রকে উন্মোচন করা হয়েছে।

৩৫. প্রশ্ন: মহান আল্লাহ কেন "جنات النعيم" না বলে "نعم النعيم" বলেননি? (لِمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى "جَنَّاتِ النَّعِيمِ" وَلَمْ يَقُلْ "نِعَمَ النَّعِيمِ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা: কুরআনের শব্দচয়ন অলৌকিক এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সূরা লুকমানের ৮ নং আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের পুরস্কারের কথা বলতে গিয়ে جَنَّاتُ النَّعِيمِ (নিয়ামতে ভরা উদ্যানসমূহ) শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য:

১. স্থান ও আধারের গুরুত্ব: 'জান্নাত' (جَنَّات) শব্দটি স্থানের নাম, যা সব ধরনের সুখ-শান্তি ও নিয়ামতকে ধারণ করে। যদি আল্লাহ শুধু 'নিয়াম' (نِعَم) বা 'নাঈম' বলতেন, তবে তা কেবল সুখ বা অনুগ্রহ বোঝাত, কিন্তু সেই সুখ ভোগ করার নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী বাসস্থানের কথা স্পষ্ট হতো না।

২. ব্যাপকতা (الشمولية): 'জান্নাতুন নাঈম' বলার মাধ্যমে আল্লাহ বুঝিয়েছেন যে, সেই স্থানটিই এমন হবে যেখানে নিয়ামতের কোনো শেষ নেই। অর্থাৎ, স্থানটি নিজেই সুখের আধার। ড. ওহবা আয-যুহাইলী (রহ.) বলেন, জান্নাত হলো এমন এক ভাণ্ডার (Makan), যার মধ্যে 'নাঈম' বা সব ধরনের দৈহিক ও আত্মিক প্রশান্তি বিদ্যমান।

৩. স্থায়ীত্ব: সুখ বা অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু 'জান্নাত' বা উদ্যান একটি স্থায়ী আবাসন। মুমিনরা সেখানে চিরকাল থাকবে, তাই স্থানের উল্লেখ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

উপসংহার: মূলত মুমিনদের পুরস্কারের পূর্ণতা এবং সেই পুরস্কারের স্থানের বিশালতা বোঝাতেই আল্লাহ তাআলা 'জান্নাতুন নাঈম' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন।

৩৬. প্রশ্ন: হযরত লুকমান (আ) তাঁর পুত্রকে কী উপদেশ দিয়েছেন? সংক্ষেপে লেখ।
(بِمَ نَصَحَ لُقْمَانُ ابْنَهُ؟ اُكْتُبْ بِإِيجَازٍ)

উত্তর:

ভূমিকা: হযরত লুকমান (আ.) তাঁর সন্তানকে যে উপদেশগুলো দিয়েছিলেন, তা কুরআনে শাশ্বত বাণী হিসেবে সংরক্ষিত আছে। এগুলো প্যারেন্টিং বা সন্তান প্রতিপালনের শ্রেষ্ঠ গাইডলাইন।

উপদেশসমূহ (نَصَائِحُ لُقْمَانَ):

সূরা লুকমানের ১৩-১৯ নং আয়াতে বর্ণিত প্রধান উপদেশগুলো হলো:

১. শিরক না করা: সর্বপ্রথম উপদেশ ছিল তাওহীদের। তিনি বলেন:
يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
অর্থ: "হে বৎস! আল্লাহর সাথে শরিক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম।"

২. পিতামাতার সেবা: আল্লাহর হকের পরেই পিতামাতার কৃতজ্ঞতা আদায় ও সেবা করার নির্দেশ।

৩. আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞান: তিনি বলেন, সরিষার দানা পরিমাণ বস্তুও যদি পাথরের ভেতরে বা আকাশে থাকে, আল্লাহ তা উপস্থিত করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ সব দেখেন।

৪. সালাত ও সৎকাজের আদেশ: তিনি বলেন, أَقِمِ الصَّلَاةَ (নামাজ কায়েম কর), সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ কর।

৫. ধৈর্য ধারণ: বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করাকে তিনি সাহসিকতার কাজ বলে উল্লেখ করেছেন।

৬. অহংকার বর্জন: তিনি বলেন, "অহংকারবশে মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না।"

৭. মধ্যমপন্থা: চালচলনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা এবং নিচু স্বরে কথা বলা। কারণ, "নিশ্চয়ই গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।"

উপসংহার: এই উপদেশগুলো ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে একজন মানুষকে আদর্শ মুমিন হিসেবে গড়ে তোলার বুনিয়াদ।

৩৭. প্রশ্ন: "ان الشرك لظلم عظيم" কে বলেছেন? এবং তা কোন্ সূরায়? (مَنْ قَالَ "إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" وَفِي أَيِّ سُورَةٍ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: পবিত্র কুরআনে শিরকের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে একটি ঐতিহাসিক উপদেশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। এটি তাওহীদের মূলভিত্তি।

বক্তা ও উৎস (الْقَائِلُ وَالْمَصْدَرُ):

- **বক্তা:** এই উক্তিটি মহান আল্লাহর একজন পুণ্যবান ও প্রজ্ঞাবান বান্দা **হযরত লুকমান (আ.)**-এর। তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে এই কথাটি বলেছিলেন।
- সূরা ও আয়াত: এই উক্তিটি পবিত্র কুরআনের সূরা লুকমান-এর **১৩** নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থ: "স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশচ্ছলে তাঁর পুত্রকে বলল: হে বৎস! আল্লাহর সাথে শরিক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম।" [1]

তাফসীরুল মুনীর-এর ব্যাখ্যা:

'জুলুম' (الظُّلْمُ) অর্থ হলো কোনো বস্তুকে তার যথাস্থান ছাড়া অন্য স্থানে রাখা। আল্লাহ তাআলা ইবাদত পাওয়ার একমাত্র হকদার। যখন কেউ ইবাদতকে গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো) জন্য নিবেদন করে, তখন সে ইবাদতকে ভুল স্থানে প্রয়োগ করল। এটাই সবচেয়ে বড় অবিচার বা 'জুলুমুন আজিম'।

উপসংহার: সুতরাং, এই ঐতিহাসিক উক্তিটি হযরত লুকমান (আ.)-এর, যা কুরআনে তাঁর নামে নামাঙ্কিত সূরায় স্থান পেয়েছে।

৩৮. প্রশ্ন: الشرك -এর অর্থ কী এবং তা কত প্রকার? (مَا مَعْنَى الشِّرْكِ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: ইসলামি আকিদা অনুযায়ী সবচেয়ে বড় পাপ হলো শিরক। তাওহীদের বিপরীত অবস্থাই হলো শিরক।

শিরকের পরিচয় (تَعْرِيفُ الشِّرْكِ):

- **আভিধানিক অর্থ:** শিরক (الشِّرْكُ) শব্দের অর্থ অংশীদার হওয়া, শরিক করা বা সমকক্ষ স্থির করা (To associate partner)।
- **পারিভাষিক অর্থ:** আল্লাহ তাআলার সত্তা (Zat), গুণাবলি (Sifat) কিংবা ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদার সাব্যস্ত করাকে শিরক বলা হয়।

শিরকের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الشِّرْكِ):

ড. ওহবা আয-যুহাইলী (রহ.)-এর তাফসীরুল মুনীর ও আকিদাহ শাস্ত্রের আলোকে শিরক প্রধানত দুই প্রকার:

১. শিরকে আকবর (الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ) বা বড় শিরক:

যা মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী করে। যেমন:

* ইবাদতে শিরক: মূর্তি পূজা করা বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সিজদা করা।

* গুণাবলিতে শিরক: আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে 'গায়েব' বা অদৃশ্যের খবর জানেন বলে বিশ্বাস করা।

২. শিরকে আসগর (الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ) বা ছোট শিরক:

যা মানুষকে কাফের বানায় না কিন্তু কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। এর প্রধান উদাহরণ হলো 'রিয়া' (الرِّيَاءُ) বা লোক দেখানো ইবাদত।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ

অর্থ: "আমি তোমাদের ব্যাপারে যা সবচেয়ে বেশি ভয় পাই তা হলো ছোট শিরক। সাহাবিরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কী? তিনি বললেন: রিয়া (লোক দেখানো আমল)।" (মুসনাদে আহমদ)

উপসংহার: শিরক মানুষের ঈমান ও আমলকে ধ্বংস করে দেয়। তাই মুমিনের জন্য সব ধরনের শিরক থেকে বেঁচে থাকা ফরজ।

---

৩৯. প্রশ্ন: সন্তানের প্রতি পিতামাতার অধিকারসমূহ বর্ণনা কর। (بَيِّنْ حُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْأَوْلَادِ)

উত্তর:

ভূমিকা: ইসলামে আল্লাহর হকের পরেই পিতামাতার হক বা অধিকারকে স্থান দেওয়া হয়েছে। সূরা লুকমানের ১৪-১৫ নং আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

পিতামাতার অধিকার (حُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ):

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে সন্তানের ওপর পিতামাতার প্রধান অধিকারগুলো হলো:

১. সদ্ব্যবহার (حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ): তাঁদের সাথে সর্বদা উত্তম আচরণ করা। ধমক দেওয়া বা 'উফ' শব্দটিও উচ্চারণ না করা। আল্লাহ বলেন: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর)। 2

২. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ (الشُّكْرُ): আল্লাহর শোকরিয়ার পাশাপাশি পিতামাতার শোকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ (আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং তোমার পিতামাতারও)।

৩. সেবা ও ভরণপোষণ: বার্ধক্যে তাঁদের সেবা করা এবং প্রয়োজনে আর্থিক দায়িত্ব বহন করা সন্তানের ওপর ফরজ। বিশেষ করে মায়ের কষ্ট ও দুগ্ধপানের কথা উল্লেখ করে কুরআনে মায়ের অধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৪. আনুগত্য (الطَّاعَةُ): বৈধ সকল কাজে পিতামাতার আদেশ মান্য করা। তবে, যদি তারা আল্লাহর নাফরমানি বা শিরক করতে আদেশ দেয়, তবে তা মানা যাবে না; কিন্তু তখনও তাদের সাথে বেয়াদবি করা যাবে না।

৫. দোয়া করা: তাঁদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর তাঁদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা—رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا।

উপসংহার: পিতামাতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাই সন্তানের জান্নাত লাভের জন্য পিতামাতার অধিকার আদায় অপরিহার্য।

---

৪০. প্রশ্ন: সূরা লুকমান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ।

(اُكْتُبِ التَّعْلِيمَاتِ الْحَاصِلَةَ عَنْ سُورَةِ لُقْمَانَ)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা লুকমান কুরআন মাজিদের এক হিকমতপূর্ণ সূরা, যা একটি আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠনের রূপরেখা প্রদান করে।

সূরা লুকমান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা (التَّعْلِيمَاتُ الْمُسْتَفَادَةُ):

১. কুরআনের হেদায়েত: কুরআন মাজিদ হলো 'হাকিম' বা প্রজ্ঞাময় গ্রন্থ। যারা সৎকর্মশীল (মুহসিন), কেবল তারাই এর মাধ্যমে প্রকৃত হেদায়েত লাভ করে।

২. শিরক বর্জন: শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম। সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই তাওহীদের শিক্ষা দেওয়া এবং শিরক থেকে সতর্ক করা প্রতিটি পিতার দায়িত্ব।

৩. প্যারেন্টিং বা সন্তান প্রতিপালন: হযরত লুকমান (আ.)-এর মতো করে সন্তানদের স্নেহের সাথে (হে বৎস! বলে) উপদেশ দেওয়া এবং আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া।

৪. পিতামাতার মর্যাদা: আল্লাহর ইবাদতের পরেই পিতামাতার স্থান। তাঁদের সেবা করা জান্নাত লাভের মাধ্যম।

৫. আচরণের সৌন্দর্য: অহংকার বর্জন করা, নম্রভাবে চলা এবং নিচু স্বরে কথা বলা মুমিনের ভূষণ। উদ্ধত আচরণ শয়তানের বৈশিষ্ট্য।

৬. গায়রুল্লাহর ইলম নেই: কিয়ামত কবে হবে, বৃষ্টি কখন হবে, মাতৃগর্ভে কী আছে, আগামীকাল কী উপার্জন হবে এবং কার মৃত্যু কোথায় হবে—এই ৫টি বিষয়ের জ্ঞান (Ilm-e-Ghayb) একমাত্র আল্লাহর কাছে। কোনো পীর, ফকির বা গণক তা জানে না।

উপসংহার: এই সূরার শিক্ষা আমাদের আকিদাকে বিশুদ্ধ করে এবং ব্যক্তিগত চরিত্রকে মার্জিত ও সুন্দর করে তোলে।

سورة السجدة (সূরা আস সাজদা)

৪১. প্রশ্ন: সূরা আস সাজদা-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।
(اُذْكُرْ وَجْهَ التَّسْمِيَةِ لِسُورَةِ السَّجْدَةِ)

উত্তর:

ভূমিকা: পবিত্র কুরআনের ৩২তম সূরা হলো 'সূরা আস-সাজদা'। এটি মক্কায় অবতীর্ণ। এই সূরাটি ঈমানের দৃঢ়তা ও আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রকাশের এক অনন্য নিদর্শন।

নামকরণের কারণ (وَجْهُ التَّسْمِيَةِ):

এই সূরার ১৫ নং আয়াতে মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তারা যখন আল্লাহর আয়াত শোনে, তখন সিজদাবনত হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا

অর্থ: "কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা এই আয়াতগুলো দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।" (সূরা সাজদা: ১৫)

যেহেতু এই আয়াতে মুমিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য 'সিজদা' বা 'সাজদা'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই আয়াতে তিলাওয়াতের সিজদাও রয়েছে, তাই একে 'সূরা আস-সাজদা' নামকরণ করা হয়েছে।

অন্য নাম: বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য একে অনেক সময় 'আলিফ-লাম-মীম তানযিল আস-সাজদা' (الم تنزيل السجدة) বা 'সাজদাতুল লুকমান'ও বলা হয়, যাতে 'হা-মীম আস-সাজদা' (সূরা ফুসসিলাত) থেকে পার্থক্য বোঝা যায়।

উপসংহার: সিজদার আয়াত ও মুমিনের সিজদাবনত হওয়ার গুণাবলি আলোচনার কারণেই এই নাম রাখা হয়েছে।

---

৪২. প্রশ্ন: সূরা আস সাজদা-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ। (اُكْتُبْ مَوْضُوعَاتِ سُورَةِ السَّجْدَةِ مُخْتَصَرًا)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আস-সাজদা মাক্কী সূরা হওয়ায় এর মূল উপজীব্য বিষয় হলো তাওহীদ, রিসালাত এবং আখেরাত। বিশেষ করে মৃত্যু পরবর্তী জীবন বা পুনরুত্থান সম্পর্কে কাফেরদের সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু (مَوْضُوعَاتُ السُّورَةِ):

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে এর প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ:

১. কুরআনের সত্যতা: সূরার শুরুতেই 'আলিফ-লাম-মীম' এবং 'তানযিলুল কিতাব' বলে কুরআনের সত্যতা এবং তা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত, তা প্রমাণ করা হয়েছে।

২. সৃষ্টিতত্ত্ব (بَدْءُ الْخَلْقِ): মানুষ ও মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য আলোচনা করা হয়েছে। আসমান-জমিন সৃষ্টি এবং মানুষকে মাটি ও নুতফা (শুক্রকীট) থেকে সৃষ্টির পর রুহ ফুঁকে দেওয়ার পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৩. পুনরুত্থান ও কিয়ামত: কাফেররা বলত, "মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আমরা কি পুনরায় সৃষ্টি হব?" আল্লাহ এর জবাব দিয়ে বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতা জান কবজ করবেন এবং পুনরায় সবাইকে রবের কাছে ফিরে যেতে হবে।

৪. মুমিন ও ফাসিকের তুলনা: যারা রাতে ইবাদত করে (তাহাজ্জুদ গুজার) এবং যারা অপরাধী (মুজরিম), তাদের পরিণতির পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। মুমিনদের জন্য জান্নাতুল মাওয়া আর ফাসিকদের জন্য জাহান্নাম।

৫. বনী ইসরাঈলের ইতিহাস: হযরত মুসা (আ.) ও তাঁর কিতাব প্রাপ্তির প্রসঙ্গ এনে মুমিনদের সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার: মূলত তাওহীদ ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাই এই সূরার মূল প্রতিপাদ্য।

---

৪৩. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী " الذى احسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ... الاية"-এর মর্মার্থ কী?
مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ... الْآيَةَ"؟

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা সাজদার ৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে মানুষের সৃষ্টির সূচনা ও পূর্ণতার কথা বলা হয়েছে।

আয়াতের মর্মার্থ (مُرَادُ الْآيَةِ):

১. সৃষ্টির নিপুণতা (إِحْسَانُ الْخَلْقِ): أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ অর্থ "তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা নিখুঁত ও সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন।" অর্থাৎ, প্রতিটি সৃষ্টিকে তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী উপযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অবয়ব দিয়েছেন। মুফাসসিরগণের মতে, এখানে 'সুন্দর' মানে হলো মজবুত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সৃষ্টি।

২. মানুষ সৃষ্টির উপাদান: وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ অর্থ "এবং তিনি কাদা-মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন।"

* এখানে 'আল-ইনসান' বা মানুষ বলতে মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। কারণ তাঁকেই সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

* পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁর বংশধরদের সৃষ্টি করা হয়েছে তুচ্ছ পানির নির্যাস (নুতফা) থেকে।

তাফসীরুল মুনীর: ড. ওহবা আয-যুহাইলী (রহ.) বলেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে আল্লাহ কেবল স্রষ্টাই নন, বরং তিনি 'আহসানুল খালিকীন' বা নিপুণতম স্রষ্টা, যিনি মাটির পুতুলকে শ্রেষ্ঠ জীবে রূপান্তর করেছেন।

উপসংহার: এই আয়াতে আল্লাহর কুদরত এবং মানবজাতির মূল উৎস (মাটি) সম্পর্কে জানিয়ে মানুষকে বিনয়ী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

---

৪৪. প্রশ্ন: "تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ... الاية" আয়াতটির শানে নুযুল বর্ণনা কর।
بَيِّنْ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ "تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ... الْآيَةَ")

উত্তর:

ভূমিকা: আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের একটি বিশেষ গুণ হলো রাতের আরাম হারাম করে ইবাদত করা। সূরা সাজদার ১৬ নং আয়াতে তাদের এই গুণের প্রশংসা করা হয়েছে।

শানে নুযুল (سَبَبُ النُّزُولِ):

মুফাসসিরগণের মতে এই আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়:

১. সালাতের অপেক্ষা: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, এই আয়াতটি ওই সব সাহাবিদের শানে নাজিল হয়েছে, যারা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে জেগে থেকে নফল নামাজ পড়তেন এবং এশার জামাতের জন্য অপেক্ষা করতেন। তাঁরা ঘুমানোর জন্য বিছানায় যেতেন না।

২. তাহাজ্জুদ নামাজ: অধিকাংশ মুফাসসির ও হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর হাদিস অনুযায়ী, এটি তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের শানে নাজিল হয়েছে। যারা রাতের শেষ ভাগে মিষ্টি ঘুম ও আরামদায়ক বিছানা ত্যাগ করে (তাতাজাফা জুনুবুহুম) আল্লাহর ভয়ে ও আশায় নামাজে দাঁড়ায়।

আয়াতের অর্থ: "তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা থাকে (ঘুমায় না), তারা তাদের রবকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদের যা রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।"

উপসংহার: মূলত রাতের ইবাদতকারী এবং জামাতের জন্য অপেক্ষাকারী মুমিনদের প্রশংসা ও উৎসাহ দিতেই এই আয়াত নাজিল হয়।

---

৪৫. প্রশ্ন: মহান আল্লাহর বাণী "نزلا" এবং "جنات المأوى"-এর মধ্যকার "جنات المأوى" দ্বারা উদ্দেশ্য কী?
مَا الْمُرَادُ بِجَنَّاتِ الْمَأْوَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا"؟

উত্তর:

ভূমিকা: মুমিন ও নেককার বান্দাদের প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। সূরা সাজদার ১৯ নং আয়াতে তাদের জন্য বিশেষ মেহমানদারির কথা বলা হয়েছে।

জান্নাতুল মাওয়া-এর উদ্দেশ্য (الْمُرَادُ بِجَنَّاتِ الْمَأْوَى):

১. শাব্দিক অর্থ: 'জান্নাত' অর্থ বাগান বা উদ্যান। 'মাওয়া' (الْمَأْوَى) অর্থ আশ্রয়স্থল, ঠিকানা বা বাসস্থান। সুতরাং 'জান্নাতুল মাওয়া' অর্থ হলো আশ্রয়ের উদ্যান।

২. পারিভাষিক বা তাফসিরি অর্থ:

* তাফসীরুল মুনীর অনুযায়ী, এটি জান্নাতের এমন এক বিশেষ স্থান, যা মুমিনদের চূড়ান্ত আবাসস্থল হবে। যেখানে তারা প্রশান্তি ও নিরাপত্তার সাথে অবস্থান করবে।

* ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটি এমন জান্নাত, যেখানে জিবরাঈল (আ.) ও অন্যান্য ফেরেশতারা অবতরণ করেন এবং শহীদদের রুহ সেখানে আশ্রয় নেয়।

* এটি আর্শের ডান পাশে অবস্থিত একটি জান্নাত।

নুযুলান (نُزُلًا)-এর অর্থ: আয়াতে উল্লেখিত 'নুযুলান' শব্দের অর্থ হলো মেহমানদারি বা আপ্যায়ন (Hospitality)। অর্থাৎ, মেহমান বাড়িতে এলে প্রথমেই তাকে যে উপহার বা খাবার দেওয়া হয়। মুমিনদের জন্য জান্নাতুল মাওয়া হবে আল্লাহ প্রদত্ত সেই প্রাথমিক সম্মাননা বা আপ্যায়ন।

উপসংহার: 'জান্নাতুল মাওয়া' দ্বারা মুমিনদের চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির আবাসনকে বোঝানো হয়েছে, যা তাদের নেক আমলের প্রতিদান।

---

৪৬. প্রশ্ন: সূরা আস সাজদা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ।
(اُكْتُبِ التَّعْلِيمَاتِ الْحَاصِلَةَ عَنْ سُورَةِ السَّجْدَةِ)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আস-সাজদা ঈমান ও আমলের সমন্বয়ে গঠিত একটি সূরা, যা মানুষকে আল্লাহর অনুগত হতে শেখায়।

প্রাপ্ত শিক্ষা (التَّعْلِيمَاتُ الْمُسْتَفَادَةُ):

১. সিজদার গুরুত্ব: কুরআনের আয়াত শুনে বা অনুধাবন করে আল্লাহর ভয়ে সিজদাবনত হওয়া প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। অহংকার ত্যাগ করে বিনয়ী হতে হবে।

২. তাহাজ্জুদের ফজিলত: রাতের আরাম ত্যাগ করে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার অন্যতম উপায়।

৩. মানুষের উৎপত্তি: মানুষ মাটির তৈরি এবং তুচ্ছ পানির ফোঁটা থেকে সৃষ্টি—এই চিন্তা মানুষকে অহংকারমুক্ত করে এবং স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে শেখায়।

৪. কিয়ামতের ভয়: মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং বিচার দিবস সত্য। অপরাধীদের (মুজরিম) সেদিন মাথা নত করে আফসোস করতে হবে, কিন্তু তখন আর ঈমান আনার সুযোগ থাকবে না। তাই দুনিয়াতেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

৫. মুমিন ও ফাসিক সমান নয়: আল্লাহর কাছে ইবাদতকারী মুমিন এবং পাপাচারী ফাসিকের মর্যাদা কখনো সমান হতে পারে না। মুমিনের জন্য জান্নাত আর ফাসিকের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। 5

৬. আল্লাহর ফয়সালা: সবকিছু আল্লাহর নির্দেশে পরিচালিত হয় (তিনি আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত কাজ পরিচালনা করেন)। তাই আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা মুমিনের কর্তব্য।

উপসংহার: এই সূরার শিক্ষা আমাদের দুনিয়ার মোহ থেকে সরিয়ে আখেরাতমুখী ও ইবাদতগুজার বান্দা হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

سورة الأحزاب (সূরা আল আহযাব)

৪৭. প্রশ্ন: সূরা আল আহযাব-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।
(اُذْكُرْ وَجْهَ التَّسْمِيَةِ لِسُورَةِ الْأَحْزَابِ)

উত্তর:

ভূমিকা: পবিত্র কুরআনের ৩৩তম সূরা হলো 'সূরা আল-আহযাব'। এটি মাদানি সূরা এবং এর আয়াত সংখ্যা ৭৩। ইসলামের ইতিহাসের এক কঠিন সন্ধিক্ষণ ও ঐতিহাসিক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই সূরা নাজিল হয়েছে।

নামকরণের কারণ (وَجْهُ التَّسْمِيَةِ):

এই সূরার ২০ ও ২২ নং আয়াতে 'আল-আহযাব' (الْأَحْزَاب) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

১. শাব্দিক অর্থ: 'আল-আহযাব' শব্দটি 'হিযব' (حِزْبٌ)-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো দলসমূহ, বাহিনী বা সম্মিলিত মোর্চা।

২. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: পঞ্চম হিজরিতে মক্কার কুরাইশ, গাতফান, বনু আসাদসহ আরবের বিভিন্ন গোত্র এবং মদীনার ইহুদিরা সম্মিলিত হয়ে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য এক বিশাল মোর্চা বা 'আহযাব' গঠন করে মদীনা আক্রমণ করেছিল। এই যুদ্ধটি ইতিহাসে 'গাযওয়ায়ে আহযাব' (আহযাবের যুদ্ধ) বা খন্দকের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

৩. বিষয়বস্তুর প্রাধান্য: যেহেতু এই সূরায় এই সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ, তাদের পরাজয় এবং মুসলমানদের অলৌকিক বিজয়ের ঘটনা বিস্তারিতভাবে

আলোচিত হয়েছে, তাই এর নামকরণ করা হয়েছে 'সূরা আল-আহযাব' বা সম্মিলিত বাহিনীর সূরা।

উপসংহার: ঐতিহাসিক যুদ্ধের স্মৃতি এবং কাফেরদের সম্মিলিত শক্তির ব্যর্থতা চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যই এই নাম রাখা হয়েছে।

---

৪৮. প্রশ্ন: সূরা আল আহযাব-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ। (اُكْتُبْ مَوْضُوعَاتِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ مُخْتَصَرًا)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আল-আহযাব মাদানি জীবনের এমন এক সময়ে নাজিল হয় যখন ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো সুদৃঢ় হচ্ছিল। তাই এতে যুদ্ধ-বিগ্রহের পাশাপাশি সামাজিক আইন-কানুন প্রাধান্য পেয়েছে।

বিষয়বস্তু (مَوْضُوعَاتُ السُّورَةِ):

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে এর প্রধান বিষয়বস্তুগুলো হলো:

১. আহযাবের যুদ্ধ: কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ, পরিখা খনন, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র এবং আল্লাহর গায়েবি সাহায্যে মুসলমানদের বিজয় লাভের বিস্তারিত বিবরণ।

২. সামাজিক সংস্কার: জাহেলি যুগের কুপ্রথা 'জিহার' (স্ত্রীকে মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করা) এবং 'পালক পুত্র' প্রথা বাতিলকরণ।

৩. নবী পরিবারের মর্যাদা: উম্মাহাতুল মুমিনিন বা নবীপত্নীদের বিশেষ মর্যাদা, পর্দা ও আচরণের বিধিমালা এবং তাঁদেরকে 'মায়ের' আসনে আসীন করা।

৪. খতমে নবুওয়াত: বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে শেষ নবী এবং তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না—এই চিরন্তন সত্যের ঘোষণা (আয়াত ৪০)।

৫. পর্দার বিধান: মুসলিম নারীদের জন্য পর্দার হুকুম বা জিলবাব (বড় চাদর) পরিধানের নির্দেশ।

৬. আদব ও আখলাক: নবীর প্রতি দরুদ পাঠের নির্দেশ এবং তাঁর শানে বেয়াদবি করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী 2।

উপসংহার: মূলত ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয়গুলোই এই সূরার মূল উপজীব্য।

---

৪৯. প্রশ্ন: কোন ব্যক্তি দাবি করেছিল যে, তার পেটে দুটি হৃদয় আছে? (مَنِ الَّذِي ادَّعَى أَنَّ فِي جَوْفِهِ قَلْبَيْنِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আহযাবের ৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ কোনো মানুষের অভ্যন্তরে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি।" এই আয়াতটি জাহেলি যুগের এক ব্যক্তির দাবির প্রেক্ষিতে নাজিল হয়।

ব্যক্তির পরিচয়:

সেই ব্যক্তিটি ছিল কুরাইশ বংশের জামিল ইবনে মা'মার আল-ফিহরী (جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ الْفِهْرِيُّ)।

- **তার দাবি:** সে ছিল বড় চালাক ও বাকপটু। তার দাবি ছিল, তার পেটে বা বক্ষে দুটি হৃদয় (ক্বলব) আছে, যা দিয়ে সে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি বোঝে এবং মনে রাখতে পারে। সে গর্ব করে বলত, "আমার দুটি মন আছে, যার একেকটি মোহাম্মদের (সা.) মনের চেয়েও উন্নত (নাউজুবিল্লাহ)।"
- **মিথ্যার অসারতা প্রমাণ:** বদর যুদ্ধের দিন যখন কাফেররা পরাজিত হয়ে পালাচ্ছিল, তখন তাকে দেখা গেল এক পালে স্যান্ডেল হাতে, আর অন্য পালে স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে দৌড়াচ্ছে। আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার এক জুতা হাতে কেন?" সে বলল, "আমি তো মনে করেছিলাম দুটিই পায়ে আছে।" তখন প্রমাণিত হলো যে, তার দাবি মিথ্যা ছিল এবং বিপদের সময় তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল [3]।

উপসংহার: আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মাধ্যমে তার সেই অযৌক্তিক দাবি নাকচ করে দেন এবং জানান যে, মানুষের হৃদয় একটিই।

---

৫০. প্রশ্ন: الاحزاب -এর অর্থ কী? কোন্ সনে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়? অথবা আহযাবের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়?
(مَا مَعْنَى الْأَحْزَابِ؟ وَفِي أَيَّةِ سَنَةٍ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمَعْرَكَةُ؟ أَوْ مَتَى وَقَعَتْ غَزْوَةُ الْأَحْزَابِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: ইসলামের ইতিহাসে আহযাবের যুদ্ধ বা খন্দকের যুদ্ধ এক চূড়ান্ত ফয়সালাকারী যুদ্ধ।

'আল-আহযাব'-এর অর্থ:

- **আভিধানিক অর্থ:** 'আল-আহযাব' (الْأَحْزَاب) শব্দটি আরবি 'হিযব' (حِزْبٌ) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো—দল, গোষ্ঠী, বাহিনী, মোর্চা বা মিত্রবাহিনী (Confederates)।
- **পারিভাষিক অর্থ:** মদীনার ইসলামি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য মক্কার কুরাইশ, গাতফান গোত্র এবং মদীনার ইহুদিদের যে সম্মিলিত বাহিনী গঠিত হয়েছিল, তাদেরকেই 'আল-আহযাব' বলা হয়।

যুদ্ধের সময়কাল (زَمَنُ الْغَزْوَةِ):

ঐতিহাসিকদের মতে আহযাবের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সন নিয়ে সামান্য মতভেদ থাকলেও বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ মত হলো:

- **হিজরি সন:** পঞ্চম হিজরি (৫ম হিজরি)।
- **মাস:** শাওয়াল মাস। (কারও মতে জিলকদ মাস)।
- **ইংরেজি সাল:** ৬২৭ খ্রিস্টাব্দ।

বি.দ্র: কোনো কোনো বর্ণনায় ৪র্থ হিজরি বলা হলেও আল্লামা ইবনে কাসীর ও ইবনে হিশাম (রহ.)-এর মতে **৫ম হিজরিই** সঠিক [4]।

উপসংহার: পঞ্চম হিজরিতে সংঘটিত এই যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদের কাছে চরমভাবে পরাজিত হয়।

৫১. প্রশ্ন: সূরা আল আহযাব-এর আলোকে আহযাবের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা কর। (بَيِّنِ الْوَاقِعَةَ لِغَزْوَةِ الْأَحْزَابِ عَلَى ضَوْءِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ)

উত্তর:

ভূমিকা: আহযাবের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। সূরা আহযাবের ৯ থেকে ২৭ নং আয়াতে এই যুদ্ধের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।

যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ (وَاقِعَةُ الْغَزْوَةِ):

১. ষড়যন্ত্র ও মোর্চা গঠন: মদীনা থেকে বিতাড়িত ইহুদি গোত্র 'বনু নাজির'-এর নেতারা মক্কায় গিয়ে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একজোট করে। প্রায় ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য রওনা হয়।

২. পরিখা খনন (The Trench): হযরত সালমান ফারসি (রা.)-এর পরামর্শে রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনার অরক্ষিত অংশে পরিখা বা খন্দক খনন করেন। ৩০০০ সাহাবি অত্যন্ত কষ্ট করে এই কাজ সম্পন্ন করেন।

৩. অবরোধ ও ভীতি: শত্রুসৈন্যরা পরিখা দেখে হতভম্ব হয়ে যায় এবং প্রায় এক মাস মদীনা অবরোধ করে রাখে। এই সময় মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। কুরআন বলছে:

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ

অর্থ: "যখন তারা তোমাদের উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি থেকে তোমাদের ওপর চড়াও হলো, যখন ভয়ে তোমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল এবং প্রাণ কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছেছিল।" (সূরা আহযাব: ১০)

৪. মুনাফিকদের আচরণ: মুনাফিকরা বলতে লাগল, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওয়াদা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।" তারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালানোর বাহানা খুঁজছিল।

৫. আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়: প্রায় এক মাস পর আল্লাহ তাআলা প্রবল ঘূর্ণিঝড় (ريح) ও অদৃশ্য ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করেন। ঝড়ে কাফেরদের তাঁবু উপড়ে

যায় এবং হাঁড়ি-পাতিল উল্টে যায়। প্রচণ্ড শীতে ও ভয়ে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا

অর্থ: "অতঃপর আমি তাদের ওপর পাঠালাম প্রচণ্ড ঝড় এবং এমন এক বাহিনী (ফেরেশতা) যা তোমরা দেখনি।" (সূরা আহযাব: ৯)

উপসংহার: কোনো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছাড়াই কেবল আল্লাহর কুদরতে ও কৌশলে এই যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে।

---

৫২. প্রশ্ন: খতমে নবুয়ত প্রমাণ করে এমন দুটি আয়াত লেখ। (أُكْتُبْ آيَتَيْنِ فِي إِثْبَاتِ خَتْمِ النُّبُوَّةِ)

উত্তর:

ভূমিকা: 'খতমে নবুওয়াত' অর্থ নবুওয়তের সমাপ্তি। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমেই নবুওয়তের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কুরআন মাজিদে এ বিষয়ে বহু আয়াত রয়েছে।

খতমে নবুওয়তের প্রমাণবহ দুটি আয়াত:

১. সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৪০: এটি খতমে নবুওয়তের সবচেয়ে স্পষ্ট ও চূড়ান্ত দলিল। আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

অর্থ: "মুহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।"

২. সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩: এই আয়াতে দ্বীনের পূর্ণতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যা পরোক্ষভাবে নবুওয়তের সমাপ্তি প্রমাণ করে। কারণ দ্বীন পূর্ণ হলে নতুন নবীর প্রয়োজন থাকে না। আল্লাহ বলেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"

উপসংহার: উল্লেখিত আয়াতগুলো দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোনো নবী আসবেন না।

---

৫৩. প্রশ্ন: طلاق -এর অর্থ কী? তা কত প্রকার? (مَا مَعْنَى الطَّلَاقِ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যখন চরম তিক্ততায় পৌঁছায় এবং সমাধানের সব পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন শরিয়ত তালাকের বিধান দিয়েছে।

তালাকের পরিচয়:

- **আভিধানিক অর্থ:** 'তালাক' (الطَّلَاقُ) শব্দের অর্থ বাঁধন খুলে দেওয়া, মুক্ত করা বা বিচ্ছিন্ন করা।
- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়ত নির্ধারিত নির্দিষ্ট শব্দাবলি প্রয়োগের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে তালাক বলা হয়।

তালাকের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الطَّلَاقِ):

শরিয়ত সম্মত পদ্ধতি ও ফলাফল বিবেচনায় তালাক প্রধানত তিন প্রকার:

১. তালাকে আহসান (الطَّلَاقُ الْأَحْسَنُ): এটি সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি। স্বামী তার স্ত্রীকে এমন 'তুহুর' বা পবিত্র অবস্থায় এক তালাক দেবে, যাতে সে সহবাস করেনি। এরপর ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেবে।

২. তালাকে হাসান (الطَّلَاقُ الْحَسَنُ): এটি উত্তম পদ্ধতি। স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তুহুরে (পবিত্র অবস্থায়) আলাদা আলাদাভাবে তিনটি তালাক প্রদান করবে।

৩. তালাকে বিদ'ঈ (الطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ): এটি শরিয়ত গর্হিত বা পাপলিপ্ত পদ্ধতি (যদিও তালাক পতিত হয়ে যায়)। যেমন: ঋতুস্রাব অবস্থায় তালাক দেওয়া অথবা এক তুহুরে বা এক মজলিসেই তিন তালাক দেওয়া।

দ্রষ্টব্য: ফলাফলের দিক থেকে তালাক দুই প্রকার—১. তালাকে রাজ'ঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) এবং ২. তালাকে বায়িন (অপ্রতাহারযোগ্য)।

---

৫৪. প্রশ্ন: দলীলসহ বিবাহের শর্তাবলি বর্ণনা কর। (بَيِّنْ شَرَائِطَ النِّكَاحِ بِالِاسْتِدْلَالِ)

উত্তর:

ভূমিকা: বিবাহ বা নিকাহ একটি পবিত্র দেওয়ানি চুক্তি ও ইবাদত। এটি শুদ্ধ হওয়ার জন্য শরিয়তে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত (Arkan & Shurut) রয়েছে।

বিবাহের শর্তাবলি (شَرَائِطُ النِّكَاحِ):

১. ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও গ্রহণ): বিবাহের মূল রুকন হলো ইজাব ও কবুল। এক পক্ষ প্রস্তাব দেবে এবং অন্য পক্ষ তা গ্রহণ করবে।

২. সাক্ষী উপস্থিত থাকা (الشُّهُودُ): বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষী থাকা আবশ্যক।

* দলিল: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

অর্থ: "অভিভাবক এবং দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হয় না।" (মিশকাত)

৩. উভয় পক্ষের সম্মতি: বর ও কনে (বা তাদের প্রতিনিধি) উভয়ের সম্মতি থাকতে হবে। জোরপূর্বক বিবাহ শুদ্ধ নয়।

* দলিল: আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا (হে ঈমানদারগণ! জোরপূর্বক নারীদের মালিক হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়)। (সূরা নিসা: ১৯)

৪. মোহরানা (الْمَهْرُ): যদিও এটি বিবাহের রুকন নয়, তবে এটি স্ত্রীর অপরিহার্য অধিকার। মোহর নির্ধারণ করা ওয়াজিব।

* দলিল: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (তোমরা নারীদের সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও)। (সূরা নিসা: ৪)

৫. অভিভাবকের অনুমতি (الْوَلِيُّ): (শাফেয়ী ও অন্যান্য মাযহাবে এটি শর্ত, হানাফি মাযহাবে সাবালিকার ক্ষেত্রে মুস্তাহাব)।

উপসংহার: উল্লেখিত শর্তগুলো পূরণ করা ছাড়া ইসলামি শরিয়তে বিবাহ সম্পন্ন হয় না।

---

৫৫. প্রশ্ন: هبة শব্দ দ্বারা কি বিবাহ সংঘটিত হবে? সুস্পষ্ট বর্ণনা দাও। (هَلْ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ؟ بَيِّنْ بِالْإِيضَاحِ)

উত্তর:

ভূমিকা: বিবাহ চুক্তির জন্য সাধারণত 'নিকাহ' বা 'তাযবীজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়। তবে 'হেবা' (দান) শব্দ দ্বারা বিবাহ হবে কি না, তা নিয়ে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সূরা আহযাবের ৫০ নং আয়াতে এ প্রসঙ্গে আলোচনা এসেছে।

হেবা শব্দ দ্বারা বিবাহের হুকুম:

১. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য খাস:

কোনো মোহরানা ছাড়া নিজেকে 'হেবা' বা দান করার মাধ্যমে বিবাহ করা একমাত্র নবী করীম (সা.)-এর জন্য বৈধ ছিল। এটি তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য (খাসাইস)।

* দলিল: সূরা আহযাবের ৫০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ... خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থ: "এবং কোনো মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ (হেবা) করে... এ বিধান বিশেষ করে আপনার জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়।"

২. সাধারণ উম্মতের ক্ষেত্রে (ইমামদের মতভেদ):

* ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে: সাধারণ কোনো মুসলমানের বিবাহ 'হেবা' শব্দ দ্বারা সংঘটিত হবে না। কারণ বিবাহের জন্য 'নিকাহ' বা 'তাযবীজ' শব্দ জরুরি।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও জমহুরের মতে: যদি বিবাহের উদ্দেশ্য থাকে এবং সাক্ষীরা উপস্থিত থাকে, তবে 'হেবা', 'সদকা' বা 'দান' শব্দ দ্বারাও বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো, এক্ষেত্রে মোহরানা মাফ হবে না। রাসূল (সা.)-এর মতো বিনামূল্যে বিবাহ হবে না, বরং 'মোহরে মিসল' (স্বাভাবিক মোহরানা) ওয়াজিব হয়ে যাবে।

উপসংহার: 'হেবা' বা নিজেকে দান করার মাধ্যমে মোহরানা ছাড়া বিবাহ করা একমাত্র রাসূল (সা.)-এর জন্য খাস ছিল। অন্যদের ক্ষেত্রে এই শব্দে বিবাহ হলেও মোহরানা দিতে হবে।

---

৫৬. প্রশ্ন: ইমামগণের মতভেদসহ মোহরানার পরিমাণ বর্ণনা কর। (بَيِّنْ مِقْدَارَ الْمَهْرِ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ)

উত্তর:

ভূমিকা: মোহরানা (الْمَهْرُ) হলো স্ত্রীর এমন একটি আর্থিক অধিকার, যা বিবাহের কারণে স্বামীর ওপর ওয়াজিব হয় [1]। শরিয়তে মোহরানার সর্বোচ্চ কোনো সীমা নেই, তবে সর্বনিম্ন সীমা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

মোহরানার পরিমাণ (مِقْدَارُ الْمَهْرِ):

১. সর্বোচ্চ পরিমাণ:

এ ব্যাপারে সমস্ত ফিকহবিদ একমত যে, মোহরানার কোনো সর্বোচ্চ সীমা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

অর্থ: "এবং তোমরা যদি তাদের কাউকে অঢেল সম্পদও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না।" (সূরা নিসা: ২০)। হযরত ওমর (রা.) একবার

মোহরের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এক মহিলার আপত্তির মুখে তিনি তা প্রত্যাহার করে বলেন, "মহিলাটি সঠিক বলেছে, ওমর ভুল করেছে।"

২. **সর্বনিম্ন পরিমাণ (মতভেদ):**

- হানাফি মাযহাব: ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মোহরানার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো ১০ দিরহকাম (রৌপ্য মুদ্রা)। এর চেয়ে কম মোহর নির্ধারণ করা বৈধ নয়। তাদের দলিল হলো হাদিস:

لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

অর্থ: "দশ দিরহকামের চেয়ে কম কোনো মোহর নেই।" (বায়হাকি ও দারা কুতনি)।

- **মালিকি মাযহাব:** ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো **৩ দিরহকাম** বা এক দিনারের এক-চতুর্থাংশ। তিনি চুরির শাস্তির (হাত কাটার নিসাব) ওপর কিয়াস করে এই মত দিয়েছেন।

- **শাফেয়ী ও হাম্বলি মাযহাব:** ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে, মোহরানার **কোনো নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন সীমা নেই**। যা কিছু সম্পদ বা মূল্য হিসেবে গণ্য (যেমন একটি লোহার আংটি বা এক জোড়া জুতা), তা-ই মোহর হতে পারে। দলিল হিসেবে তাঁরা সেই হাদিস পেশ করেন যেখানে রাসূল (সা.) এক সাহাবিকে বলেছিলেন, "একটি লোহার আংটি হলেও মোহর হিসেবে দাও।" এমনকি কুরআন শিক্ষা দেওয়াকেও মোহর হিসেবে গণ্য করা যায়।

উপসংহার: সামর্থ্য অনুযায়ী সম্মানজনক মোহর নির্ধারণ করাই উত্তম। বর্তমানে দেশীয় মুদ্রায় ১০ দিরহকামের মূল্য (রুপার দাম অনুযায়ী) সর্বনিম্ন মোহর হিসেবে ধর্তব্য হবে হানাফি মাযহাবে।

---

৫৭. প্রশ্ন: মহানবী (স)-এর ওপরও কি দেনমোহর ওয়াজিব ছিল? যেসকল রমণী নিজেদেরকে মহানবী (স)-এর জন্য হেবা করেছেন, তারা কারা? বর্ণনা কর। (هَلْ كَانَ الْمَهْرُ وَاجِبًا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؟ وَمَنْ مِنَ الْمَوْهُوبَاتِ لِلنَّبِيِّ ﷺ؟ بَيِّنْ)

উত্তর:

ভূমিকা: সাধারণ মুমিনদের জন্য বিবাহে মোহরানা ওয়াজিব। কিন্তু আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য (খাসাইস) দান করেছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো 'হেবা' বা বিনাশর্তে নিজেকে দানকারী নারীকে বিবাহের অনুমতি।

নবীর ওপর মোহরানার হুকুম:

সূরা আহযাবের ৫০ নং আয়াত অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য মোহরানা ওয়াজিব ছিল না, যদি কোনো নারী নিজেকে তাঁর কাছে 'হেবা' (আত্মনিবেদন) করেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেন। আল্লাহ বলেন:

خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থ: "এটি বিশেষভাবে আপনার জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়।"

তবে, রাসূল (সা.) হেবা ছাড়া অন্য বিবাহগুলোতে স্ত্রীদের মোহরানা প্রদান করেছেন। তিনি সাধারণত প্রত্যেক স্ত্রীকে ৫০০ দিরহকাম মোহর দিতেন (ব্যতিক্রম ছিলেন উম্মে হাবিবা ও সাফিয়া রা.)।

নিজেকে হেবাকারিনী রমণীগণ (الْمَوْهُوبَاتُ):

তাফসীরুল মুনীর ও সিরাত গ্রন্থগুলোতে একাধিক নারীর নাম পাওয়া যায়, যারা নিজেদের নবীর কাছে সমর্পণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

১. মায়মুনা বিনতে হারিস (রা.): অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, তিনি নিজেকে রাসূল (সা.)-এর কাছে হেবা করেছিলেন।

২. জয়নব বিনতে খুযায়মা (রা.): তিনি 'উম্মুল মাসাকিন' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনিও নিজেকে নবীর খেদমতে পেশ করেছিলেন।

৩. উম্মে শারিক (রা.): গাযিয়্যাহ গোত্রের এই মহিলা নিজেকে হেবা করেছিলেন।

৪. খাওলা বিনতে হাকিম (রা.): তিনি উসমান ইবনে মাজউন (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন।

উপসংহার: যদিও একাধিক নারী প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু রাসূল (সা.) তাঁদের সবাইকে গ্রহণ করেননি। যাদের গ্রহণ করেছেন, এই বিশেষ বিধানটি কেবল তাঁর নবুওয়তের সম্মানে দেওয়া হয়েছিল।

---

৫৮. প্রশ্ন: নবী কারীম (স)-এর স্ত্রীগণের নাম উল্লেখ কর। (اُذْكُرْ أَسْمَاءَ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

উত্তর:

ভূমিকা: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে কুরআনে 'উম্মাহাতুল মুমিনিন' বা মুমিনদের জননী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সূরা আহযাবের ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "তার স্ত্রীগণ তাদের (মুমিনদের) মা।"

উম্মাহাতুল মুমিনিনগণের নাম (أَسْمَاءُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ):

ঐতিহাসিকদের মতে রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীগণের সংখ্যা **১১** জন। তাঁদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

১. হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.): প্রথমা স্ত্রী।

২. হযরত সাওদা বিনতে জাম'আ (রা.): খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁকে বিবাহ করেন।

৩. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.): একমাত্র কুমারী স্ত্রী।

৪. হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রা.): হযরত ওমর (রা.)-এর কন্যা।

৫. হযরত জয়নব বিনতে খুযায়মা (রা.): তিনি বিয়ের অল্প দিন পরেই ইন্তেকাল করেন।

৬. হযরত উম্মে সালামা (হিন্দ) (রা.): একজন ধৈর্যশীলা নারী।

৭. হযরত জয়নব বিনতে জাহশ (রা.): আল্লাহর নির্দেশে (আহযাব: ৩৭) তাঁর সাথে বিবাহ হয়।

৮. হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা.): বনু মুস্তালিক যুদ্ধের পর বিবাহ হয়।

৯. হযরত উম্মে হাবিবা (রামলা) (রা.): আবু সুফিয়ানের কন্যা।

১০. হযরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.): ইহুদি সর্দার হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা।

১১. হযরত মায়মুনা বিনতে হারিস (রা.): সর্বশেষ বিবাহিতা স্ত্রী।

দ্রষ্টব্য: মারিয়া আল-কিবতিয়া (রা.) ছিলেন দাসী (উম্মে ওয়ালাদ), তাই অনেকে তাঁকে উম্মাহাতুল মুমিনিনদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন না।

উপসংহার: এই মহীয়সী নারীরা মুসলিম উম্মাহর আধ্যাত্মিক মা এবং শরীয়তের বিধান প্রচারের অন্যতম মাধ্যম।

---

৫৯. প্রশ্ন: সূরা আল আহযাব থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ। (اُكْتُبِ التَّعْلِيمَاتِ الْحَاصِلَةَ عَنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আল-আহযাব রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক বিধানের এক বিশাল ভাণ্ডার। এই সূরা থেকে আমরা ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বহু নির্দেশনা পাই।

সূরা আল-আহযাবের শিক্ষা (التَّعْلِيمَاتُ الْمُسْتَفَادَةُ):

১. আল্লাহর ওপর ভরসা (التَّوَكُّلُ): আহযাবের যুদ্ধের ঘটনা শিক্ষা দেয় যে, শত্রুসংখ্যা যত বেশিই হোক, আল্লাহর সাহায্য থাকলে বিজয় সুনিশ্চিত। মুমিনরা বিপদে ভীত হয় না।

২. নবীর আনুগত্য ও ভালোবাসা: মুমিনদের জান-মালের চেয়েও নবীর অধিকার বেশি। নবীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করা ইবাদত।

৩. পর্দার বিধান (الْحِجَابُ): মুসলিম নারীদের জন্য পর্দা বা জিলবাব পরিধান করা ফরজ। এটি তাদের সম্ভ্রম রক্ষা করে এবং ইভটিজিং থেকে বাঁচায়।

৪. সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণ: জাহেলি যুগের 'পালক পুত্র' প্রথা বাতিল করা হয়েছে। পালক পুত্রকে নিজের রক্তের সন্তানের মর্যাদা দেওয়া যাবে না এবং তাদের আসল পিতার পরিচয়ে ডাকতে হবে।

৫. খতমে নবুওয়াত: হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে নবুওয়তের দাবিদার মিথ্যাবাদী।

৬. মুনাফিকদের চরিত্র: বিপদের সময় যারা অজুহাত দেখায় এবং পালিয়ে যেতে চায়, তারাই মুনাফিক। এদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

৭. আমানতদারিতা: আসমান-জমিন ও পাহাড় যে আমানত (শরিয়তের দায়িত্ব) বহন করতে ভয় পেয়েছে, মানুষ তা বহন করেছে। তাই এই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

উপসংহার: সূরা আল-আহযাব আমাদের শেখায় কীভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ঈমানের ওপর অটল থাকতে হয় এবং একটি পবিত্র সমাজ গঠন করতে হয়।